Vol. 60 | No. 3 | 2025

Check for updates

সাহিত্য পত্রিকা

journal.bangla.du.ac.bd

হাসান আজিজুল হকের গল্প: মুক্তিযুদ্ধের শিল্পভাষ্য

Volume	60
Issue	3
Year	2025
ISSN	0558-1583
eISSN	3006-886X
Author(s)	Nur Nahar Sarmin Sultana
Published online	November 30, 2025
DOI	10.62328/sp.v60i3.7
Link to article	https://doi.org/10.62328/sp.v60i3.7
Pages	121-135
Publisher	University of Dhaka
Copyright	সাহিত্য পত্রিকা
Designed and Developed by	Zobayer Abdullah

Check for updates

মৌলিক গবেষণা প্রবন্ধ

সাহিত্য পত্রিকা

Journal.bangla.du.ac.bd
Print ISSN: 0558-1583
Online ISSN: 3006-886X
বর্ষ: ৬০ সংখ্যা: ৩
আষাঢ় ১৪৩২॥ জুন ২০২৫
প্রকাশকাল: নভেম্বর ২০২৫
Issue DOI: 10.62328/sp.v60i3

DOI: 10.62328/sp.v60i3.7
প্রবন্ধ জমাদান: ২০ এপ্রিল ২০২৫
প্রবন্ধ গৃহীত: ২২ জুন ২০২৫
পৃষ্ঠা: ১২১-১৩৫

হাসান আজিজুল হকের গল্প: মুক্তিযুদ্ধের শিল্পভাষ্য

নূর নাহার শারমিন সুলতানা
সহকারী অধ্যাপক, বাংলা ভাষা ও সাহিত্য বিভাগ, সাউথইস্ট বিশ্ববিদ্যালয়
ইমেইল: nurnaharsarmin@gmail.com

সারসংক্ষেপ

বাংলাদেশের কথাসাহিত্যের ধারায় হাসান আজিজুল হক (১৯৩৯-২০২১) প্রাতিস্বিক ব্যক্তিত্ব। গত শতকের ষাটের দশকে বাংলা সাহিত্যাঙ্গনে তাঁর দীপ্র আবির্ভাব। ছোটোগল্পের ধারায় তাঁর সাফল্য ও সিদ্ধি অবিসংবাদিত। সমকালীন সমাজ ও জীবনের বিচিত্র বিষয় তাঁর ছোটোগল্পে স্থান পেয়েছে। শিল্পের দায়বোধ থেকে আর্থ-সামাজিক-রাজনৈতিক পরিস্থিতির বিবিধ বিষয়, রাঢ়বঙ্গের জীবন, দ্বিতীয় বিশ্বযুদ্ধোত্তর দুর্ভিক্ষপীড়িত সমাজ, সাম্প্রদায়িক দাঙ্গা, স্বদেশি আন্দোলন, মুক্তিযুদ্ধ ও যুদ্ধোত্তর বাস্তবতা প্রভৃতি বিষয়কে অসাধারণ নৈপুণ্যে রূপায়িত করেছেন তিনি। মুক্তিযুদ্ধকে উপজীব্য করে গল্পরচয়িতাদের মধ্যে হাসান আজিজুল হক নিঃসন্দেহে অগ্রগণ্য। মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গ ও প্রেক্ষিত বহুমাত্রিক তাৎপর্যসহ তাঁর গল্পে চিত্রিত হয়েছে। বর্তমান প্রবন্ধে তাঁর ছোটোগল্পে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধের নানা অনুষঙ্গের স্বরূপ অন্বেষার প্রয়াস গৃহীত হয়েছে।

মূলশব্দ

স্বাধিকার আন্দোলন, গণহত্যা, নারী নির্যাতন, শরণার্থী, গেরিলা যুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধ, মুক্তিযুদ্ধোত্তর বাস্তবতা, প্রতিরোধ সংগ্রাম, মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক সাহিত্য।

স্বাধীনতা-পরবর্তীকালে বাংলাদেশের সাহিত্যে মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে রচিত হয়েছে উল্লেখযোগ্য সংখ্যক ছোটোগল্প। বশীর আল হেলাল, আলাউদ্দিন আল আজাদ, শওকত ওসমান, হাসান আজিজুল হক, আবু জাফর শামসুদ্দীন, শওকত আলী, সাদেকা সফিউল্লা, বিপ্রদাশ বড়ুয়া, হারুন হাবীব, জুবায়দা গুলশান আরা, খালেদা সালাউদ্দিন, এহসান চৌধুরী, সৈয়দ ইকবাল, রশীদ হায়দার, আবুবকর সিদ্দিক, রাবেয়া খাতুন, সৈয়দ শামসুল হক, মকবুলা মনজুর, কাজী জাকির হাসান, রিজিয়া রহমান, সেলিনা হোসেন প্রমুখ কথাশিল্পী রচনা করেছেন মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটোগল্প। এসব গল্পে পাকিস্তানি হানাদার বাহিনীর অতর্কিত আক্রমণ, নৃশংস গণহত্যা, লুণ্ঠন, ধর্ষণ, অগ্নিসংযোগ ও বাস্তুহারা অসহায় মানুষের দেশত্যাগ প্রভৃতি বিষয় যেমন স্থান পেয়েছে, তেমনি অকুতোভয় বীরের আত্মত্যাগ ও বীরত্বপূর্ণ প্রতিরোধ সংগ্রামের চিত্রও প্রতিফলিত হয়েছে। কথাশিল্পী হাসান আজিজুল হক অন্তর্গত তাগিদে উদ্বুদ্ধ হয়েই মুক্তিযুদ্ধভিত্তিক ছোটোগল্প রচনা করেছেন।

হাসান আজিজুল হক ছিলেন মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষদর্শী; ফলে প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতা এবং মুক্তিযুদ্ধ সংক্রান্ত সমকালীন বাস্তবতা তাঁর গল্পে শিল্পসত্যে উদ্ভাসিত হয়েছে। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে ছোটোগল্প রচনায় তিনি স্বতন্ত্র বৈশিষ্ট্যের অধিকারী। তা ছাড়া সমকালীন সাহিত্যিকদের সাহিত্যে প্রতিফলিত মুক্তিযুদ্ধ বিষয়ে তাঁর বিরূপ মন্তব্যে ফুটে উঠেছে কিছু সীমাবদ্ধতার কথা। যে সীমাবদ্ধতাকে তিনি তাঁর মুক্তিযুদ্ধ অবলম্বনে রচিত গল্পে অতিক্রম করার চেষ্টা করেছেন। প্রাসঙ্গিক অংশ স্মর্তব্য—

> মুক্তিযুদ্ধে যে যা দেখেছেন লিখে ফেলেছেন, লক্ষ লক্ষ বুলেট নিক্ষেপ করেছেন কাগজে, ক্রাইম স্টোরি লেখার মতো করে কিন্তু সে অসম্ভব কষ্টকর, নিদারুণ যন্ত্রণার পথটা দিয়ে এ পর্যন্ত কেউ যাননি। এ পথে আছে বাংলাদেশের বাইশ বছরের ইতিহাস, বাইশ বছরের রাজনীতি, মানুষের ক্রোধ, হতাশা আর বিদ্রোহ, আছে আট কোটি মানুষের তপ্ত রক্তের সর্বনাশা বন্যা, আছে কোটি কোটি মানুষের নিদারুণ দেশত্যাগের অপমান আর বর্ণনাতীত দুঃখ, আছে দাউদাউ করে পুড়ে যাওয়া অগণিত মানুষের ক্ষেতখামার, বাড়িঘরের তপ্ত চিহ্ন, লক্ষ লক্ষ নরহত্যার তাণ্ডব, লক্ষ লক্ষ বলাৎকারের পাপ আর আছে এক বিশাল ক্রোধের অগ্নি যা থেকে জন্ম হলো বাংলাদেশের। সেই মহৎপ্রাপ্তি আর বিশাল প্রবঞ্চনার ইতিহাস কেউ লেখেন নি। (হাসান ২০১৩: ৩০)।

হাসান আজিজুল হক মুক্তিযুদ্ধের প্রত্যক্ষ অভিজ্ঞতাকে অবলম্বন করে রচনা করেছেন স্মৃতিকথা জাতীয় গ্রন্থ *একাত্তর: করতলে ছিন্নমাথা*। এ গ্রন্থে মুক্তিযুদ্ধের অভিজ্ঞতাকে শিরোনামহীন গল্পের আকারে উপস্থাপন করেছেন তিনি। এ গ্রন্থে বর্ণিত মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসের ভয়াবহ স্মৃতিকথার শিল্পরূপ তাঁর চতুর্থ গল্পগ্রন্থ *নামহীন গোত্রহীন* গ্রন্থের গল্পসমূহ। এ গ্রন্থে মোট গল্পের সংখ্যা ৭টি। গল্পগুলো হলো: 'ভূষণের একদিন', 'নামহীন গোত্রহীন', 'কৃষ্ণপক্ষের দিন', 'আটক', 'ঘরগেরস্থি', 'কেউ আসেনি' এবং 'ফেরা'। এ গ্রন্থের গল্পগুলোতে মুক্তিযুদ্ধকালের সামগ্রিক রূপচিত্রই যেন ধারাবাহিকভাবে বিধৃত হয়েছে খণ্ড খণ্ড রূপে। 'সাতটি গল্পের সমগ্রতায় মুক্তিযুদ্ধের সূচনা ও সমাপ্তিকে হাসান বাস্তবের আলোকে ধারণ করতে চেয়েছেন' (জাফর ১৯৯৬: ৮৪)। গল্পগুলোর অবয়বে ফুটে উঠেছে মুক্তিযুদ্ধে পাকহানাদার বাহিনীর আক্রমণ, হত্যা, লুটপাট, অগ্নিসংযোগ, নারী নির্যাতন, সাধারণ মানুষের প্রাণভয়ে ছোটাছুটি, বাস্তুভিটা ত্যাগ, গেরিলা যুদ্ধ, যুদ্ধে নিহত মানুষের স্তূপ, যুদ্ধাহত মানুষের দুর্ভোগ, অবশেষে বিজয়লগ্নে পাকিস্তানি বাহিনীর পলায়ন, যুদ্ধ পরবর্তী

মানুষের হতাশা, যন্ত্রণা প্রভৃতি বিষয়। তা ছাড়া লেখকের *রোদে যাবো* গ্রন্থের 'ঝড়', 'নবজাতক' এবং *বিধবাদের কথা ও অন্যান্য গল্প* গ্রন্থের 'বিধবাদের কথা', *আমরা অপেক্ষা করছি* গ্রন্থের 'মাটির তলার মাটি' গল্পের বিষয়-বিন্যাসেও রয়েছে মুক্তিযুদ্ধের চেতনা। 'মুক্তিযুদ্ধকে অবলম্বন করে তাঁর গল্প আমাদের অভিজ্ঞতার সীমাকে বাড়িয়ে দিয়েছে' (হাসনাত ২০০৭: ১০)। এসব গল্পে পরিস্ফুটিত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধ ও তৎপরবর্তী সময়ের বাস্তবচিত্র।

> ভূষণ দেখলো গোড়া কেটে ফেললে গাছ যেমন আস্তে আস্তে মাটিতে শুয়ে পড়ে, মানুষ তেমনি করে মাটিতে পড়ছে। ... এরপরই সে রক্ত দেখতে পায়। কোন মানুষের মাথা থেকে, কারো পা থেকে, কারো কাঁধ, বুক বা পেট থেকে ফিনকি দিয়ে রক্ত ছুটতে থাকে। রক্ত ছোটার কলকল ঝরঝর শব্দটাই যা ভূষণ শুনতে পায় না—কিন্তু দলে দলে মানুষ মাটিতে শুয়ে পড়ছে এটা সে দেখতে পায়। ... চিৎকার করতে করতে মানুষজন তীব্র বেগে দৌড়াতে দৌড়াতে মাটিতে হুমড়ি খেয়ে পড়ে, কেউ মুহূর্তের জন্য দাঁড়িয়ে মুখ ফিরিয়ে একবার নদীর দিকে তাকায়, তারপর তলপেট চেপে মাটিতে বসে পড়ে আর রক্ত ছোটে কলকল ঝনঝন শব্দে। শানের মতো সাদা পথের উপর দিয়ে রক্ত এত দ্রুত গড়িয়ে যায় যে তাতে সাদা ফেনা দেখা যায়—কোথাও ঘাস ভিজে যায়—ডগায় রক্তের বিন্দু নিয়ে লম্বা ঘাস দুলতে থাকে। (হাসান ২০১১: ২৪৮-২৪৯)

মৃত্যুকাতর অজস্র মানুষ ছটফট করছে, কেউবা একটু পানি চাইছে, সৃষ্টিকর্তাকে ডাকছে, কিন্তু পাকিস্তানি সৈন্যদের বর্বর নির্যাতনের হাত থেকে রেহাই পায়নি কেউই। অসংখ্য মৃত্যুপথযাত্রী মানুষের মাঝে ভূষণ দেখতে পায়, বাচ্চা কোলে তেঁতুল গাছের দিকে এগিয়ে আসছে চব্বিশ-পঁচিশ বছরের একটি মেয়ে। কিছুক্ষণ পর গুলির শব্দ হয়, এবং ভূষণ দেখে—

> মেয়েটির হাত দিয়ে গলগল করে রক্ত আসছে—শেষে রক্ত মাখানো সাদা মগজ বাচ্চাটার ভাঙা মাথা থেকে এসে তার মায়ের হাত ভর্তি করে দিলো। মেয়েটি ফিরে দাঁড়াল, বাচ্চার মুখের দিকে চাইল, পাগলের মতো ঝাঁকি দিলো তাকে কবার—তারপর অমানুষিক তীক্ষ্ণ চিৎকার করে ছুঁড়ে ফেলে দিলো বাচ্চাটাকে; দু হাতে ফালা ফালা করে ছিঁড়ে ফেললো তার ময়লা ব্লাউজটাকে। তার দুধে-ভরা ফুলে-ওঠা স্তন দুটিকে দেখতে পেল ভূষণ। সে সেই বুক দেখিয়ে চেঁচিয়ে উঠলো, মার হারামির পুত, খানকির পুত—এইখানে মার। পরমুহূর্তেই পরিপক্ক শিমুল ফলের মতো একটি স্তন ফেটে চৌচির হয়ে গেল। ছিটকে এসে সে পড়ল তেঁতুলতলায়। (হাসান ২০১১: ২৪৯)

এভাবেই মুক্তিযুদ্ধের বাস্তবতা বুঝে ওঠার আগেই গণহত্যার শিকার হয় অসংখ্য নিরীহ মানুষ। *নামহীন গোত্রহীন* গ্রন্থের নামগল্প 'নামহীন গোত্রহীন' গল্পেও গণহত্যা ও নির্যাতনের চিত্র ফুটে উঠেছে। এ গল্পে নামহীন এক পথচারীর বাড়ি ফেরার বর্ণনায় যুদ্ধকালীন নাগরিক জীবনবাস্তবতা উন্মোচিত হয়েছে। বিকেলের ট্রেন থেকে প্লাটফর্মে নেমেই চেনা শহরকে অচেনা বোধ হয় সেই মানুষটির। চতুর্দিক অন্ধকার। দোকানপাট বন্ধ, লোকালয় জনমানবশূন্য, কোথাও কোনো সাড়াশব্দ নেই। নিস্তব্ধ এ অন্ধকারে একসময় বুটের শব্দ কানে আসে তার, সে সঙ্গে বিজাতীয় ভাষায় বিকট হুংকার—'কৌন হ্যায় উধার?' রাতের অন্ধকারে শহরের অলিগলি অতিক্রম করতে করতে পথচারীর কাছে দৃশ্যমান হয়

পাকবাহিনীর ভয়াবহ, নির্মম, নৃশংস নানা ঘটনার চিত্র। তাদের হাতে জিম্মি শহরের মানুষগুলো যেন নিঃশ্বাস ফেলতেও ভয় পায়। অন্ধকার ফাঁকা রাস্তায় নানা অলিগলি পার হয়ে অবশেষে একটি গলিতে এসে সে দেখতে পায়, সাধারণ এক পথচারীকে তারা জেরা করছে, সেই সঙ্গে চলছে অকথ্য ভাষায় গালিগালাজ, কিল-ঘুষি, চড়-থাপ্পড়সহ অমানুষিক নির্যাতন। লেখকের ভাষায়–

> কয়েক মিনিট পর গলি থেকে সে দেখতে পেল একতলা বাড়ির ছাদের দিকে কারো প্যান্ট পরা লোকটা উঠে যাচ্ছে। তার মাথা মাটির দিকে। পা দুটো একসঙ্গে বেঁধে একতলার ছাদের লোহার রডে দড়ি আটকে কপিকলের মত দড়িতে টান দিচ্ছে কয়েকজন সৈন্য। কালো প্যান্ট পরা লোকটার মাথা মাটি থেকে ফুট পাঁচেক উঠে গেলে একটা কণ্ঠ বলে, ব্যাস, রোখো। কেয়া, জয় বাংলা নেহি হো?
>
> নেহি। ... পাঁচ ফুট উপর থেকে প্যান্ট পরা লোকটার মাথা শরীরের সমস্ত ওজনসহ বাঁধানো মেঝেয় এসে ঠুকে পড়ল। ঠাস করে একটি শব্দ উঠল—প্যান্ট পরা লোকটা তার বুকের ভিতর থেকে বলল, আঃ।
>
> ... কালো প্যান্ট পরা লোকটার গলা থেকে ঘড়ঘড় আওয়াজ বের হয়। সেই আওয়াজটাকেই কথায় পরিণত করে সে বলে, বাঙালি তুম লোগোকো খতম করেগা—আভি ভাগ যাও বাঙাল মুল্লুকসে—কথা শেষ হবার আগেই সেই মাটিতে কাঁচা মাংস থ্যাঁতলানোর আওয়াজ। (হাসান ২০১১: ২৫৭)

এমন নির্মম অত্যাচারের সাক্ষী পথচারী মানুষটি তীব্র মানসিক যন্ত্রণায় উন্মাদপ্রায় হয়ে পড়ে। 'মাতালের মতো দুলতে দুলতে' সে তার বাড়ির আঙিনায় এসে উপস্থিত হয়। মোলায়েম কণ্ঠে ডাকতে থাকে স্ত্রী মমতাকে। সাড়া শব্দ না পেয়ে হন্যে হয়ে খুঁজতে থাকে স্ত্রী-সন্তানকে। একপর্যায়ে জংধরা কোদাল দেখে সে বুঝতে পারে তার স্ত্রী-সন্তানদের খুন করে মাটি চাপা দেওয়া হয়েছে। এমতাবস্থায় তার পাগলাটে চোখের দৃষ্টি আরো গোলমেলে হয়ে উঠল। সে কোদাল তুলে নিল এবং পাগলের মতো মাটি খুঁড়ে তুলে আনে পাঁজরের হাড়, হাতের অস্থি, হাঁটুর লম্বা নলি, শুকনো খটখটে পায়ের পাতা, একটি ছোট্ট হাত, দীর্ঘ চুলের রাশ, কোমল কণ্ঠাস্থি, ছোটো ছোটো পাঁজরের হাড়, প্রশস্ত পাঁজরের হাড়, একটি করোটি। এতক্ষণ নামহীন যে পথচারীর দৃষ্টিতে পুরো শহরের ভয়াল চিত্র দৃশ্যায়িত হয়েছে, গল্পের শেষে মাটি খুঁড়ে স্ত্রী-সন্তানের দেহাবশেষ সংগ্রহের মর্মান্তিক দৃশ্যটির অবতারণার মাধ্যমে লেখক গল্পের আবহকে উচ্চমাত্রায় পৌঁছে দিয়েছেন। মুক্তিযুদ্ধকালীন বাস্তবতার সচিত্র এক প্রতিবেদন তিনি তুলে ধরেছেন পাঠকের সামনে। গ্রাম ও শহরের আবালবৃদ্ধবণিতা, জাত-ধর্ম নির্বিশেষে সকলেই পাকসেনাদের নির্মম-নৃশংস অত্যাচারের শিকার হয়েছে।

মুক্তিযুদ্ধ চলাকালীন বাংলাদেশের প্রতিটি গ্রাম-শহর, লোকালয় হয়ে পড়েছিল এক একটি মৃত্যুপুরী। হাসান আজিজুল হক তাঁর গল্পগুলোতে সে সময় ঘটে যাওয়া গণহত্যা ও নির্যাতনের চিত্র বিভিন্ন গল্পে নানাভাবে তুলে ধরেছেন। কিছু গল্পে গণহত্যা ও নির্যাতনের পাশাপাশি গেরিলা যোদ্ধাদের প্রতিরোধ আন্দোলনের দিকটিও প্রতিফলিত হয়েছে। 'ভূষণের একদিন' গল্পে গ্রামের যুবকদের প্রতিরোধ গড়ে তোলার কথা বর্ণিত হয়েছে। তিনটি ছেলে ভূষণকে যুদ্ধে অংশ নিতে উদ্বুদ্ধ করে। তারা বলে, 'দেশের যে ছয় কোটি মানুষ আছে—

তাদের মধ্যে চাষিরাও অন্তর্ভুক্ত, তাই ভয়ে আঁতকে উঠলে চলবে না।' তাদেরকেও যুদ্ধে অংশগ্রহণ করতে হবে, পাকিস্তানিদের শোষণ-অত্যাচার থেকে এ দেশের মানুষকে মুক্ত করতে হবে, ভয় পেলে চলবে না। তাদের এই সাহস ও উৎসাহের কার্যকর পদক্ষেপ দেখা যায় 'কৃষ্ণপক্ষের দিন' গল্পে। এ গল্পে রাজাকারের হাতের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে পাঁচ সদস্যের একটি মুক্তিযোদ্ধার দল পালিয়ে যায়; এর মাধ্যমে গেরিলা যোদ্ধাদের যুদ্ধ কৌশলনীতি ও বাস্তবতার বিশ্বস্ত চিত্র উদ্ভাসিত হয়েছে। এই পাঁচজনের মধ্যে জামাল বিশ্ববিদ্যালয়ে, শহীদ কলেজে এবং একরাম স্কুলে পড়ে; এ ছাড়া মতিয়ুর ক্ষেতমজুর, রহমান চাষি। অর্থাৎ সকল শ্রেণি-পেশার মানুষের স্বতঃস্ফূর্ত অংশগ্রহণে মুক্তিযুদ্ধ সংঘটিত হয়েছে—এই বাস্তব সত্যটি এখানে উন্মোচিত হয়েছে।

গল্পের শুরুতে দেখা যায়, পাক-সেনাদের ভয়ে ছুটতে ছুটতে বিলের পাশে এসে পৌঁছায় তারা এবং বিল পার হয়ে অন্য গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার সিদ্ধান্ত নেয়। হানাদার ও তাদের সহচরেরা ততক্ষণে মেতে উঠেছে নির্বিচার লুণ্ঠন, গুলিবর্ষণ, নারী নির্যাতন, অগ্নিসংযোগে। মানুষের কান্না ও আর্তনাদে ভারী হয়ে উঠেছে বাতাস। কিছু মানুষ বিলের জলে গলা ডুবিয়ে আত্মগোপনের চেষ্টা করল। কিন্তু সেনাবাহিনী বিলের ধারেও এসে পড়েছে। তাদের অস্তিত্ব টের পেয়ে মুক্তিযোদ্ধার দল 'কোমর থেকে শরীরের বাকি অংশ জলের সমান্তরাল করে গুড়ি মেরে এগিয়ে ঝোপের আড়াল নিল'। দূর থেকে তারা দেখতে পেল বিলের কিনারে সারিবদ্ধভাবে দাঁড় করিয়ে হানাদাররা একটির পর একটি মানুষ মারছে, যেন মানুষ খুন করার পৈশাচিক উৎসবে মেতেছে। মুক্তিযোদ্ধারা দেখতে পায়, একজন সৈন্য এক নারীকে 'রাস্তার পাশে খানার মধ্যে ফেলে দিয়ে তার উপর ঝাঁপিয়ে পড়ল, শিকারের টুঁটি কামড়ানো বাঘের মতো সৈন্যটির মাথা নড়তে লাগল, পাগলাটে অমানুষিক হাসি ভেসে এলো, তীক্ষ্ণ আর্তচিৎকার সব শব্দ ছাপিয়ে তীরের মতো বাতাস কেটে চলে গেল—'। এমন দৃশ্য দেখে গেরিলা যোদ্ধারা তীব্র ক্ষোভে ফুঁসে উঠে সিদ্ধান্ত নেয় ঘুরে দাঁড়ানোর, পাল্টা প্রতিশোধ নেওয়ার। কিন্তু তার আগেই একটি গুলি এসে মুক্তিযোদ্ধা একরামের কপালে লাগলো। 'বুলেট তার কপালের বাঁ পাশে লেগে মাথার পিছন ফুঁড়ে বেরিয়ে গেছে।' মুক্তিযোদ্ধা দলটির কনিষ্ঠতম সদস্য একরাম দেশের প্রতি অদম্য ভালোবাসার টানে গেরিলা বাহিনীতে যোগ দিয়েছিল; এভাবেই দেশের জন্য প্রাণ দিতে হলো তাকে। একরামের মৃত্যু তার সহযোদ্ধাদের মনে প্রবল কষ্টের উদ্রেক করে। কেঁদে ফেলে রহমান। অসহ্য যন্ত্রণা অনুভব করে মতিয়ুর: 'এই যন্ত্রণা মতিয়ুর বের করে ফেলতে চাইছে, কিন্তু সেটা গলনালীর মধ্যে আটকে রয়েছে, এজন্য পুরো আক্ষপেটা তার মুখে ফুটে উঠেছে।'

মুক্তিযুদ্ধের বিভিন্ন পর্যায়ে গেরিলারা বনে-জঙ্গলে, খালে-বিলে, ডোবায় আত্মগোপন করে যুদ্ধ করেছে। চোখের সামনে সহযোদ্ধাকে হারিয়েছে, দেখেছে অজস্র লাশ, রক্তলাল জনপদ, পাক হায়েনাদের নৃশংসতা। তীব্র যন্ত্রণায় তাদের হৃদয়ে রক্তক্ষরণ হয়েছে, কিন্তু সেই শোক ও যন্ত্রণা তাদের সাহস জুগিয়েছে, প্রেরণা দিয়েছে; অদম্য সাহসে তারা গর্জে উঠেছে। তারা দৃঢ় সংকল্পবদ্ধ হয়েছে শত্রুদের প্রতিহত করার জন্য। প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে গেরিলা যুদ্ধ করেছে মুক্তিযোদ্ধারা। অনাহারে অর্ধাহারে দিনাতিপাত করেছে। কখনো কখনো, বিশেষ করে রাতের বেলা যদি কেউ খাবারের ব্যবস্থা করত, তখন রাতের আঁধারে লুকিয়ে খেয়ে আসত। অস্ত্র বা প্রশিক্ষণ প্রায় কিছুই তাদের ছিল না। পাকিস্তানি মিলিটারি কিংবা

রাজাকারদের ঘায়েল করে তাদের অস্ত্র কেড়ে নিয়ে সে অস্ত্র দিয়ে যুদ্ধ করেছে। এসব অস্ত্র প্রাণের চেয়েও মূল্যবান ছিল তাদের কাছে। তাই এ গল্পের মুক্তিযোদ্ধাদেরও দেখা যায় রাজাকারদের কাছ থেকে লুট করা ভারী রাইফেল বহন করে সাঁতরে বিল পার হতে কষ্ট হলেও সন্তানের মতো সে রাইফেলকে বুকে আগলে রেখেছে তারা। দলনেতা বিশ্ববিদ্যালয়ের ছাত্র জামিলের কড়া নির্দেশ, 'একটি অস্ত্রও ফেলে যাওয়া যাবে না। তোমার জানের চেয়ে একটি অস্ত্রের দাম অনেক বেশি।' অবিরাম যুদ্ধ ও নির্বিচার হত্যালীলার মধ্যে মুক্তিযোদ্ধাদের মনে কখনো কখনো হতাশা ভর করে। এমনই হতাশাচ্ছন্ন কোনো এক মুহূর্তে এক গেরিলা যোদ্ধার মনে প্রশ্ন জাগে—

> মুক্তিযুদ্ধ করে কি হবে? কি হবে আমড়ার আঁটি? দুটো খানসেনা মারতে গেলে পাঁচশো নিরীহ গ্রামের মানুষ মরছে। গেরিলা কায়দায় যুদ্ধ করে ঘোড়ার ডিম হবে। মানুষকে প্রটেকশন দিতে না পারলে কাদের জন্য যুদ্ধ? যুদ্ধ শেষ হতে হতে দেশের সব মানুষ কাবার হয়ে যাবে। (হাসান ২০১১: ৪২)।

গেরিলা যোদ্ধাদের নেতা জামিল তখন তার অনুপ্রেরণাদায়ী বক্তব্যের মাধ্যমে জাগিয়ে তোলে তার সহযোদ্ধাদের। দেশমাতৃকার জন্য সংগ্রামে তাদের উদ্বুদ্ধ করে সে: '... সবসময় লড়ে যাওয়া। বন্দুক যখন চালাচ্ছি এবং যখন চালাচ্ছি না তখনো লড়ে যাওয়া—যখন হাঁটছি ঘুমোচ্ছি বা কথা বলছি, তখনো তখনো—একেবারে শেষ পর্যন্ত লড়ে যাওয়া।' তা ছাড়া মুক্তিযোদ্ধাদের আলাপচারিতায়ও তাদের কাছে মুক্তিযুদ্ধের মাহাত্ম্য স্পষ্ট হয়ে ওঠে—

> কাউকে এ দেশের বুকের উপর বসিয়ে দেবার জন্য আমরা লড়ছি না। আমরা মালিক বদলাতে চাই না। প্রথমে ধরো এই বীভৎস গণহত্যা আর লুটতরাজ। আমরা এই শুয়ারের বাচ্চাদের দেখাবো—ওদের দাঁত ভেঙে দেব। তারপর এই দেশ এ দেশের সমস্ত মানুষের হাতে যাবে। (হাসান ২০১১: ২৭০-৭২)

বছরের পর বছর ধরে শোষণের জাঁতাকলে পিষ্ট মানুষগুলোর মুক্তিযুদ্ধ সম্পর্কে এই বোধই তাদের ক্রমশ আরো আত্মপ্রত্যয়ী করে তোলে, যা যুদ্ধ পরিচালনার অনুপ্রেরণা হিসেবে কাজ করে। এ গল্পের অদম্য ও দুঃসাহসী মুক্তিযোদ্ধারা এক পর্যায়ে পাকিস্তানি সেনাদের রাইফেল লুট করতে গিয়ে ধরা পড়ে। একজন কৌশলে আত্মরক্ষা করতে পারলেও অবশিষ্ট তিনজনকে নদীর ধারে দাঁড় করিয়ে গুলি করে হত্যা করা হয়।

মুক্তিযুদ্ধের প্রাথমিক পর্বে যুদ্ধাস্ত্র ও সামরিক শক্তির কারণে পাকিস্তানি বাহিনী দেশের প্রতিটি প্রান্তে ত্রাসের রাজত্ব প্রতিষ্ঠায় সক্ষম হলেও সময়ের পরিক্রমায় বাঙালির মুক্তির আকাঙ্ক্ষা ক্রমশ দুর্বার হয়ে ওঠে। নির্যাতন সর্বগ্রাসী হলেও মুক্তিপাগল মানুষের প্রতিরোধকে ঠেকাতে পারেনি হানাদারেরা, বাধ্য হয়েছে পশ্চাদপসরণ করতে। 'আটক' গল্পে চিত্রায়িত হয়েছে মুক্তিযুদ্ধের শেষ পর্যায়ে গ্রামেগঞ্জে মুক্তিযোদ্ধাদের আক্রমণের তোড়ে দখলদার পাকিস্তানি বাহিনীর পিছু হটার দৃশ্য। পাকবাহিনীকে কোণঠাসা করতে মিত্রবাহিনীর হান্টার প্লেনের টহল শুরু হয়েছে। পাকিস্তানি সেনাবাহিনীর সাঁজোয়া গাড়িগুলো পিছু হটতে শুরু করেছে। তাদের পালানোর দৃশ্য বর্ণিত হয়েছে এভাবে—

> সৈনিকরা পালাচ্ছে। অসম্ভব দ্রুতগতিতে জিপগুলো চলে যাচ্ছে এক একটা চলন্ত জঙ্গলের মতো। প্রত্যেকটি স্বয়ংক্রিয় যানের উপর চাপানো রয়েছে খেজুর আর নারকেল পাতা।

> বড়ো বড়ো অশ্বত্থ বা বটগাছের কাঁচা পাতাসুদ্ধ ডাল এনে চাপানো হয়েছে। যে সমস্ত গাড়ির এসব জোটেনি সেগুলো চাপিয়েছে ফ্যাকাশে সবুজ শ্যাওলা রঙের দড়ির জাল। সৈন্যরা বিষণ্ন আর সন্ত্রস্ত হয়ে বসে আছে। ভারি ভারি চেহারার অফিসাররা বিব্রত ও হতভম্ব। (হাসান ২০১১: ২৮০)

যে পাকিস্তানি সৈন্যরা দীর্ঘ নয় মাস এ দেশের মানুষের ওপর চালিয়েছে অমানুষিক নির্যাতন, মেতে উঠেছে হত্যা-লুণ্ঠন-ধর্ষণে, পরাজয় অত্যাসন্ন জেনে ভয়ে তারা প্রাণ বাঁচাতে ছুটছে দিগ্বিদিক। কেউ কেউ ছোটো ছোটো দলে বিভক্ত হয়ে ঝোপঝাড়ের আড়ালে আধশোয়া হয়ে আছে। তবে পাকসেনাদের দর্পচূর্ণ হলেও তাদের এ দেশীয় সহযোগী রাজাকারদের আস্ফালন তখনো কমেনি। তাই ভারতীয় মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবিমানকে লক্ষ্য করে 'রাজাকাররা থ্রি নট থ্রি রাইফেল থেকে ঝাঁকে ঝাঁকে গুলি চালাচ্ছে।' এ গল্পে একটি পাটের গুদামে লুকিয়ে থাকা পাকিস্তানি সৈন্যদের লক্ষ্য করে মিত্রবাহিনী বোমা নিক্ষেপ করলে ধসে পড়া দুই দেয়ালের মাঝে আটকে যাওয়া এক যুবকের বাঁচার আকুতিই গল্পের মূল বিষয় হিসেবে প্রাধান্য অর্জন করেছে। উপস্থিত অনেকেই ছেলেটিকে বাঁচানোর চেষ্টা করলেও শেষ পর্যন্ত তাকে বাঁচানো গেল না। সকলের সামনেই ছটফট করতে করতে ছেলেটির মৃত্যু ঘটল। লেখক এ ঘটনার মাধ্যমে একটি মানবিক বিষয়কে প্রস্ফুটিত করতে চেয়েছেন। যুদ্ধ মানেই শত্রু-মিত্র দুই পক্ষের পাল্টাপাল্টি আক্রমণ, আর সেই আক্রমণের শিকার মূলত সাধারণ মানুষ, তাদের জীবন, সম্পদ সবকিছু।

মুক্তিযুদ্ধ কোনো বিচ্ছিন্ন ঘটনা নয়—দীর্ঘদিনের অত্যাচার-নিপীড়ন, অন্যায়-অবিচার এবং তার বিরুদ্ধে ধারাবাহিক আন্দোলনের ফল আমাদের মুক্তিযুদ্ধ। নয় মাসের এই জনযুদ্ধ সাধারণ মানুষের জীবনযাত্রা স্তব্ধ করে দেয়। বিশেষভাবে ক্ষতিগ্রস্ত হয় গ্রামাঞ্চলবাসী নিম্নবিত্ত, দরিদ্র শ্রেণির মানুষ। মুক্তিযুদ্ধে ধর্মধ্বজী পাকিস্তানি হানাদারদের নিষ্ঠুর প্রতিহিংসার শিকার হয়েছে সংখ্যালঘু হিন্দু জনগোষ্ঠী। সারাদেশ থেকে দলে দলে হিন্দুরা আশ্রয় নিয়েছে পার্শ্ববর্তী ভারতের শরণার্থী শিবিরে। দেশ স্বাধীন হওয়ার পর এসব উদ্বাস্তু বুকভরা আশা নিয়ে আবার ফিরে এসেছে নিজ দেশে। 'ঘরগেরস্থি' গল্পে হিন্দু ধর্মাবলম্বী রামশরণের জীবন চিত্রায়ণে যুদ্ধকালীন এই বাস্তবতার প্রকৃত চিত্র প্রতিফলিত হয়েছে। যুদ্ধের শুরুতে পাকিস্তানি সেনাদের আক্রমণের পূর্বেই কিছু মুসলমান যুবকের অত্যাচার-নির্যাতনের শিকার হয়ে বাস্তুভিটা ত্যাগ করে ভারতের শরণার্থী শিবিরে আশ্রয় নিতে বাধ্য হয় হতদরিদ্র রামশরণ। দুর্বৃত্তরা হিন্দুদের বাড়িতে অগ্নিসংযোগ, লুটপাট, নারী নির্যাতন, বসতভিটা থেকে উচ্ছেদ করাসহ নানা রকম নির্যাতন চালায়। রামশরণের দুধেল গাভি, নিত্যব্যবহার্য থালা বাটিসহ সবকিছু ছিনিয়ে নিয়ে আধ ঘণ্টার মধ্যে তাকে বাস্তুত্যাগে বাধ্য করে। তার জীবনের সেই বেদনাদায়ক দৃশ্যের বর্ণনা লেখকের ভাষায়—

> দরজি বাড়ির ছেলে রশিদ এসে গোয়ালের গোঁজ থেকে দুধেল গাইটিকে খুলে দড়ি ধরে নিয়ে গেল যেন চড়াতে নিয়ে যাচ্ছে মাঠে। ... দুপুরে যখন খেতে বসে রামশরণ, সেইসময় পশ্চিমবাড়ির বিদায়চরণ নিজেরই বাড়িতে খড়ের গাদায় পুড়ে পোড়া কয়লার মতো হয়ে গেল; ঘটনাটি ঠিকমত বুঝে ওঠার আগেই চার পাঁচটা ছেলে এসে বলে কাকা আর কত খাবা? ... কাঁসার থালাটা—যেটায় খাচ্ছো, ওটা আমাদের লাগবে। দেরি করতি পারতিছি না, অন্য বাড়িতে যাতি হবে তাই কচ্ছি তাড়াতাড়ি খাওয়া সেরে থালাটা দ্যাও। (হাসান ২০১১: ৩০৩)

যুদ্ধ শেষে স্বাধীন দেশে নিজের বাসস্থানে অনেক আশা নিয়ে ফিরে আসে রামশরণ। ফিরে এসে আবার নিরুদ্দেশের পথে পাড়ি জমাতে বাধ্য হয় সে। তার আশা ছিল, স্বপ্ন ছিল—দেশ স্বাধীন হলে সব ঠিক হয়ে যাবে, আর কোনো দুঃখ কষ্ট থাকবে না। কিন্তু যুদ্ধ-পরবর্তী বাস্তবতা তাকে অনেক বেশি মর্মাহত করে। মুক্তিযুদ্ধের প্রবল ঝড়ে বিধ্বস্ত রামশরণের জীবন। যুদ্ধ কী, কেন হচ্ছে তা বুঝে ওঠার আগেই বসতবাড়ি থেকে উৎখাত হয় সে। অতঃপর শরণার্থী শিবিরের যন্ত্রণাদগ্ধ জীবন, সেখানে অন্নাভাবে সন্তানের মৃত্যু, এমনকি মৃত সন্তানের সৎকার পর্যন্ত করতে না পারার যন্ত্রণা সহ্য করতে হয় রামশরণকে। তবু সে স্বপ্ন দেখে স্বাধীনতার, স্বদেশ প্রত্যাবর্তনের। সন্তানের সৎকারের ব্যাপারে তার বক্তব্য—'বাড়িতে মরলি অমন শ্যাল কুকুরের ছানার মতো ফেলে তো দিতি হয় না।' নয় মাসের উদ্বাস্তু জীবন শেষে বুকভরা আশা নিয়ে স্বাধীন দেশে নিজ গৃহে প্রত্যাবর্তন করে রামশরণ। আবার নতুন করে গুছিয়ে বসার স্বপ্নে বিভোর হয় স্বামী-স্ত্রী। 'গোয়াল, গাই-গরু, হাল-বলদ, জমি-জমা, পুকুর ভর্তি মাছ আর গোলাভরা ধানে'র স্বপ্ন তাকে বিহ্বল করে তোলে। দুজনে মিলে দূর করবে সংসারের সকল অভাব, দুঃখ-কষ্ট। কিন্তু বাস্তবতা বড়ো কঠিন। গৃহে ফিরে হৃদয়বিদারক এক পরিস্থিতির মুখোমুখি হয় তারা। লেখকের বর্ণনায়—

> কালো মাটির ভাঙা-চোরা ভিটে, আধপোড়া খুঁটি, থ্যাবড়ানো এনামেলের বাটি, ভাঙা ঝুড়ি, ঝাঁটা, উনুনের পোড়া মাটি আর ছাই— ... বাড়িঘরগুলো ভিতর দিয়ে যে অসংখ্য গলি ছিল—যেখানে সেখানে কুমড়ো আর লাউয়ের মাচা—খোলা খামারে গরু বাঁধা এতগুলো ডোবা! এ সব গেল কোথায়? সব উবে গিয়ে এই গুটিকতক ন্যাংটো ভিটে? রামশরণ বাঁক কাঁধে দুলতে দুলতে বলে এইডা না? ... সান্ত্বনা দেবার মতো ভানুমতী বলে, ক্যানো মিছে খুঁজে মরতিছ? ... সব ভিটেই তো সমান—শরিকে কি ঝগড়া করতি আসতিছে? কথাটা ভালো করে ভেবে বিচার করে দেখলো রামশরণ। কোন বাড়িই যখনই আস্ত নেই, ভাগাভাগির জন্য দ্বিতীয় প্রাণীই যখন নেই হাজির, তখন নিজের ভিটার জন্যে এত খোঁজ খবরের দরকারটা কি? (হাসান ২০১১: ৩০৬)

ছয় সন্তানের মধ্যে তিনজনকে নিয়ে ফিরে এলো রামশরণ। প্রত্যাবর্তনের রাতেই মারা গেল ছোটো সন্তান অরুন্ধতী। ক্ষুধার যন্ত্রণায় যে সারাদিন মায়ের শুষ্ক স্তনে মুখ গুঁজে ক্ষুধা নিবারণের ব্যর্থ চেষ্টা করে যাচ্ছিল। দিনশেষে রিলিফের চালের ভাত খেয়ে নিশ্চিন্তে ঘুমিয়েছিল। অথচ ঘুমের মধ্যেই সে মরে গেল। এই সন্তানটিকেও দাহ করতে ব্যর্থ রামশরণ। রামশরণের স্ত্রী কেঁদে কেঁদে বলে, 'ওরে এট্টু আগুন দেবা না? মেয়েডা এট্টু আগুন পাবে না, হায় রে!' জবাবে রামশরণের বক্তব্য—'পুড়িয়ে আর কি সদগতি হবেনে? ভগোবান ফগোবান নাই বুজলি?' স্বাধীনতা পূর্ববর্তী এবং পরবর্তী উভয় সময়েই অভাব-দারিদ্র্যের সঙ্গে লড়াই করতে করতে সৃষ্টিকর্তার প্রতিও যেন অনাস্থা জন্মেছে রামশরণের। রাজ্য-রাষ্ট্রের পালাবদল, এত কষ্ট, এত ত্যাগ, কোনো কিছুর বিনিময়েই তার জীবনে শান্তি এলো না। তাই স্বাধীনতা প্রসঙ্গে তার বক্তব্যে ফুটে উঠে তীব্র ক্ষোভ ও হতাশা। তার দৃষ্টিকোণ আশ্রিত ভাষ্য—

> স্বাধীন হইছি তাতে আমার বাপের কি? আমি তো এই দেহি, গত বছর পরাণের ভয়ে পালালাম ইন্ডেয়—নটা মাস শ্যাল কুকুরের মতো কাটিয়ে ফিরে আলাম স্বাধীন দ্যাশে। আবার সেই শ্যাল কুকুরের ব্যাপার। ছোওয়াল মিয়ের হাত ধরে আজ ইষ্টিশান, কাল জাহাজ ঘাট ... আমি খাতি পালাম না—ছোয়াল মিয়ে শুকিয়ে মরে, স্বাধীনটা কেঁয়ানে?

> রিলিফের লাইনে দাঁড়াও ফহিরের মতো—ভিক্ষে করো লোকের বাড়ি বাড়ি। ...আগে এট্টা ভিটে ছিল—এখন তাও নেই। আমি স্বাধীনটা কিসি? (হাসান ২০১১: ৩০৮)

দরিদ্র কৃষক রামশরণ উপলব্ধি করে, অনেক রক্তের বিনিময়ে কেনা স্বাধীন দেশেও তার অধিকার বলে কিছু নেই। নতুন এক যুদ্ধের মুখোমুখি হয়েছে সে। এ যুদ্ধে তার কোনো সমব্যথী নেই, সহযোদ্ধা নেই। একের পর এক সন্তানের মৃত্যু জীবন ও জগতের প্রতি প্রবল বিতৃষ্ণায় ভরে তোলে রামশরণের মন। তিক্ত মনে সে ভাবে—হয়তো ঈশ্বর নেই, থাকলে তার ওপর এমন অনাচার ঘটত না। যদিও এ জনমানবহীন শূন্যভূমিতে আশ্রয় নিতেও তার আপত্তি থাকত না; কিন্তু যুদ্ধপরবর্তী সময়ে সরকার গ্রামে গ্রামে রিলিফের চাল, ডাল ও বাড়ি তৈরির সরঞ্জাম বিতরণ শুরু করলেও এই প্রত্যন্ত, জনহীন অঞ্চলে তা পৌঁছুবে কি না এ ব্যাপারে সন্দিহান ছিল রামশরণ। তাই তাকে আবার নামতে হয় নিরুদ্দেশ যাত্রায়। মুক্তিযুদ্ধ ও স্বাধীনতা নিম্নবিত্ত মানুষের জীবনে কোনো সুফল বয়ে আনতে পারেনি, তারা বরং দরিদ্র থেকে দরিদ্রতর হয়েছে। রামশরণদের হতে হয়েছে বাস্তুহীন পথের ভিখিরি। লেখক এখানে স্বাধীনতাপ্রাপ্তির স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা শিল্পরূপে দেখার প্রয়াস পেয়েছেন।

১৯৭১ সালের মুক্তিযুদ্ধ এ দেশের প্রতিটি প্রান্তে দুর্মর চিহ্ন রেখে গেছে। এ ছিল সত্যিকারের এক জনযুদ্ধ যাতে জাতি-ধর্ম-বর্ণ নির্বিশেষে সকল মানুষ সম্পৃক্ত হয়েছে। পাকিস্তানি হানাদার সাধারণ মানুষের জীবনে যে ভয়ংকর তাণ্ডব সৃষ্টি করেছিল, তার তুলনা ইতিহাসে বিরল। এই যুদ্ধে কেবল লক্ষ লক্ষ মানুষের প্রাণত্যাগ ও হাজার হাজার নারীর সম্ভ্রমহানিই ঘটেনি, বিপুল রক্তপাত ও ধ্বংসযজ্ঞ মানুষের মনে সৃষ্টি করেছে পোড়া ক্ষতের। 'কেউ আসে নি' গল্পে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধার জীবনের করুণ পরিণতির চিত্র পরিস্ফুট হয়েছে। চারদিকে বিজয়ের আনন্দ, স্বাধীনতার সূর্য উঠেছে, তাই রাস্তাঘাটে, ঘরে-বাইরে আনন্দ করছে মানুষ। এরই মধ্যে যুদ্ধাহত মুক্তিযোদ্ধা আসফ আলি ও গফুরের মনে মুক্তিযুদ্ধের প্রাপ্তি নিয়ে সংশয় দেখা দিয়েছে। আসফ আলি ভগ্নপ্রায় মন নিয়ে গফুরের কাছে জানতে চায়, হাসপাতালে কেউ তাকে দেখতে এসেছে কি না। গফুর রাইফেল কাঁধে নিয়ে রাস্তাঘাটে ঘুরে বেড়ায়। স্বাধীনতার আনন্দে উত্তাল মানুষকে দেখে তার মনে সংশয় দেখা দেয়—স্বাধীনতার মর্মার্থ সাধারণ মানুষ আসলেই বুঝতে পেরেছে কি না। রাইফেল কাঁধে ঘুরে বেড়ানো গফুরকে দেখে আনন্দরত মানুষের বিব্রত ও জিজ্ঞাসু চেহারা দেখে নিজেকে অপাঙ্‌ক্তেয় মনে হয় তার। অর্থাৎ যুদ্ধের অব্যবহিত পরই যুদ্ধের মূল চেতনা থেকে নিজেদের বিযুক্ত করতে শুরু করেছে মানুষ। পচনধরা, কাটা পা নিয়ে অসহায় মৃত্যু ঘটে তার সহযোদ্ধা আসফ আলির। এই কাটা পা যেন মুক্তিযোদ্ধাদের হতাশা আর অপ্রাপ্তির বোধের এক প্রতীক। মুক্তিযুদ্ধের অব্যবহিত পরবর্তী সময়ের জীবনবাস্তবতা মানুষকে নতুন উপলব্ধিতে জাগ্রত করে। তারা বুঝতে পারে, স্বাধীনতা যুদ্ধের পরপরই আরেক যুদ্ধ শুরু হয়েছে এ দেশে। সে যুদ্ধ স্বাধীনতার মর্মার্থ উপলব্ধি ও স্বাধীনতার চেতনাকে মনে ও মননে স্থান দেয়ার যুদ্ধ। স্বাধীনতার আবেগের সঙ্গে সংকীর্ণ স্বার্থসিদ্ধির সংঘাতই ছিল যুদ্ধপরবর্তী জীবনবাস্তবতার প্রাত্যহিক চিত্র।

হাসান আজিজুল হকের 'কেউ আসে নি' গল্পে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বের জীবনবাস্তবতার স্বরূপ উন্মোচিত হয়েছে। যুদ্ধশেষে হতাহত মানুষকে স্তূপাকারে হাসপাতালে জড়ো করা হচ্ছে।

'পাশে একটা, উপরে একটা, কোনাকুনি একটা, আড়াআড়ি একটা, উপরে একটা, পাশে একটা। আড়াআড়ি কোনাকুনি পাশাপাশি গলাগলি' (হাসান ২০১১: ২৮৫)। এসব মৃতদেহের মধ্যে তিনটি জীবিত। তার মধ্যে একজন আসফ আলি। তার সহযোদ্ধা গফুর যুদ্ধে এক পা হারিয়ে খোঁড়া হয়ে হাঁটে। তারা সবাই গাঁয়ের মানুষ। তাই গফুর আসফ আলির খোঁজ নিতে এসেছিল হাসপাতালে। আসফ আলির হাঁটুতে গুলি লেগেছে। ডাক্তার বলেছে 'হাঁটুর উপর থেকে পা-টা কেটে ফেলতে হবে—মাংসে পচন ধরে গেছে।' কেটে ফেলা পায়ের জন্য আসফ আলির অন্তর্যাতনা এক হৃদয়বিদারক দৃশ্যের অবতারণা করে। প্রাসঙ্গিক বর্ণনা—

> আমার ঠ্যাং কেটে ফালায়ে দিইছে?
> হ।
> কাটা ঠ্যাংটা কনে?
> জানিনে।
> আনে দিতে কও। আমার ঠ্যাং আনে দিতে কও। আমি দ্যাখপো।
> ও আর দেখতে নেই—গফুর বোঝালো।
> আমি বাড়ি যাবো। আমার ঠ্যাং নে বাড়ি যাবো। আমার মারে দেখাবো। (হাসান ২০১১: ২৯১)

যুদ্ধাহত এই মানুষগুলো, যাদের সর্বোচ্চ ত্যাগের বিনিময়ে দেশ স্বাধীন হলো, যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই তারা ভীষণ হতাশায় মুষড়ে পড়ল। তাদের মনে দেখা দিল শঙ্কা, দুশ্চিন্তা, ভয় আর অন্তহীন জিজ্ঞাসা। মুক্তিযোদ্ধা গফুর নদীর পাড়ে দাঁড়িয়ে শহরে ফেরা মানুষদের দেখে। চারদিকে হৈ-হুল্লোড়, আনন্দ-মিছিল। গফুর ভাবে, এই আনন্দ কি গ্রামেও হচ্ছে? নাকি সেখানে শুধু পাকা ফসলের খেত, নদীনালা, হলুদ ঘাস। গ্রামের কথা ভাবতেই গফুরের মনে পড়ে তার স্ত্রীকে, যুদ্ধের আগেই যে অভাবের কারণে তাকে ছেড়ে চলে গিয়েছিল। গফুর ভাবতে থাকে, এখন সে মুক্তিযোদ্ধা—দেশের জন্য যুদ্ধ করেছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। আগে অন্যের জমিতে কামলা খাটত, এখন স্বাধীন দেশেও কি 'আবার গিয়ে কামলা খাটবে রাইফেল খাকি-টাকি ফেরত দিয়ে? না কি অন্য ব্যবস্থা কিছু করবে?' অন্যদিকে আসফ আলির মনেও চাপা কষ্ট। গফুর আলীকে তাই সে বলে, 'দেশ স্বাধীন হলে কি হয়? কই, কেউ তো সে আমারে কলো না যে দ্যাশ স্বাধীন হইছে। কেউ তো কলো না এখন কি হবে?' আসফ আলির মনেও অনেক স্বপ্ন ছিল দেশ স্বাধীন হবে, অথচ সে স্বপ্নপূরণের তৃপ্তিকে উপভোগ করার সুযোগ না পেয়েই তাকে চলে যেতে হলো পরপারে।

পরাধীনতার শৃঙ্খল ভেঙে দেশমাতৃকাকে স্বাধীন করার স্বপ্ন নিয়েই বাংলার দামাল ছেলেরা যুদ্ধে গিয়েছিল। যে কৃষক কাস্তে ফেলে অস্ত্র হাতে তুলে নিয়েছিল, যে রাখাল কাঁধে বন্দুক ঝুলিয়েছিল, ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায়, শ্রেণি-পেশা নির্বিশেষে যে তরুণ পাকিস্তানি হানাদারদের প্রতিরোধ করার জন্য লড়াইয়ে শরিক হয়েছিল, তাদের বুকের মধ্যে ছিল একটিমাত্র আকাঙ্ক্ষা—দেশের স্বাধীনতা। স্বাধীনতার পর কী হবে তা নিয়ে সচেতনভাবে না ভাবলেও এটা নিশ্চয়ই ভেবেছিল যে, দেশ স্বাধীন হলে মাথার ওপর একটা ছাদ থাকবে, গোলাভরা ধান না থাকুক, না খেয়ে অন্তত থাকতে হবে না। এ স্বপ্নকে বুকে নিয়েই দীর্ঘ নয় মাস প্রাণের মায়া তুচ্ছ করে যুদ্ধ করেছে এ দেশের বীর সন্তানেরা। বনে-জঙ্গলে ঘুরে বেড়িয়েছে। যুদ্ধে অনেকেই প্রাণ হারিয়েছে; যারা বেঁচে ছিল, তারা গৃহে প্রত্যাবর্তন করেছে; তবে অনেকেই আহত হয়েছে, গুলিবিদ্ধ হয়েছে, পঙ্গুত্ব বরণ করেছে। কিন্তু এত ত্যাগের

পরও তারা তাদের প্রার্থিত শান্তি পাবে কি না তা নিয়ে ছিল দ্বিধা, সংশয়, উদ্বেগ ও উৎকণ্ঠা। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণায় বিদ্ধ হতে থাকে মানুষ। হাসান আজিজুল হক নিজেও এ বিষয়ে ছিলেন সংক্ষুব্ধ। প্রাসঙ্গিক অংশ লক্ষণীয়—

> মানচিত্রে জলজ্যান্ত বাংলাদেশ দপদপ করে জ্বলছে আর সেই বাংলাদেশকে খুঁজে খুঁজে হয়রান হচ্ছে মানুষ! ১৬ ডিসেম্বরের পরে ভারত থেকে ফিরে আসা নিরন্ন সর্বস্ব খোয়ানো মানুষ স্ত্রী-পুত্র কন্যার হাত ধরে বাংলাদেশ খুঁজে মরছে; নেই, নেই তার কেউ নেই, কোথাও নেই বাংলাদেশ। স্বপ্নের বাংলাদেশ, ক্ষুধার অন্নের বাংলাদেশ, বিরামের ঘর-বাড়ির বাংলাদেশ, আবরণের বস্ত্রের বাংলাদেশ, বাস্তব বাংলাদেশ! সে কি উধাও হয়েছিল ১৬ ডিসেম্বরের পরে পরেই? আসতে-না-আসতেই, দেখা দিতে না দিতে। (হাসান ২০০৩: ৩২৫)

'ফেরা' গল্পেও যুদ্ধ শেষে মুক্তিযোদ্ধাদের ঘরে ফেরা এবং যুদ্ধপরবর্তী সময়ে 'মুক্তিযোদ্ধাদের প্রত্যাশাভঙ্গজনিত নৈরাশ্যের চিত্র উন্মোচিত হয়েছে' (Abdullah 261)। এ গল্পের কেন্দ্রীয় চরিত্র আলেফ যুদ্ধক্ষেত্রে গুলিবিদ্ধ হয়। ওসমান ডাক্তার 'বড়ো ভোঁতা একটা দিয়ে ছুরি দিয়ে কচমচ করে মাংস কেটে বুলেটটা আঁতিপাঁতি করে খুঁজেছিল।' অবশেষে গুলি বের করে সেলাই করে দেওয়া হয়েছে। মাথায় গুলি খেয়ে মাসখানেক পর ওসমান ডাক্তারও মারা যান। আরেক সহযোদ্ধা শরীফ কোথায় আছে বা আদৌ বেঁচে আছে কি না তাও জানে না আলেফ। হাসপাতালে মৃত্যুর সঙ্গে পাঞ্জা লড়ে আমিন। তার 'ডান ঠ্যাংটা কেটে ফেলে দেবার তিন দিন পর সমস্ত শরীর পচে দুর্গন্ধ হয়ে' মরে গেল। আমিনের শেষ খবর নেয়ার জন্য হাসপাতালে তিন দিন অপেক্ষা করল আলেফ, কারণ সে নিশ্চিত করতে চায়, আমিন ফিরে আসবে এ আশায় তার বৃদ্ধা জননী যেন অর্থহীন অপেক্ষায় না থাকেন। যুদ্ধ শেষ হতে না হতেই স্বার্থপর কিছু মানুষ ব্যতিব্যস্ত হয়ে ওঠে নিজেদের আখের গোছানোর কাজে। পরিবারের সবাই ভাবে, যুদ্ধ শেষ হয়েছে, মুক্তিযোদ্ধা সন্তান নিজের ঘরে ফিরে এসেছে, তাই এবার হয়তো তাদের ভাগ্যের পরিবর্তন হবে। এ গল্পের যুদ্ধফেরত আলেফকেও এমন অভিজ্ঞতার মুখোমুখি হতে হয়। কিন্তু আলেফ বুঝতে পারে না, তাদের এ আকাঙ্ক্ষা সে কীভাবে পূরণ করবে। যুদ্ধপূর্বকালীন সময়েও তার জীবনে অভাব-দারিদ্র্য ছিল, অভাবের কারণে তার স্ত্রী তাকে ত্যাগ করে চলে গিয়েছিল, তবে যুদ্ধশেষে বাড়ি ফিরে দেখে তার স্ত্রী আবার ফিরে এসেছে। কিন্তু আলেফের মনে সংশয় জাগে—অভাব দেখে সে যদি আবার চলে যায়! তাই এক পর্যায়ে স্ত্রীকে সে জিজ্ঞেস করে—খেতে না পেলে 'আবার পালাবি না তো?' কারণ স্ত্রী ও মায়ের সঙ্গে কথা বলে সে বুঝতে পেরেছে, তাদের কাছে দেশ স্বাধীন হওয়া মানে—দুঃখ-কষ্ট আর থাকবে না, ভাত কাপড় পাবে। যুদ্ধফেরত আলেফের কাছে তার মা আবদারও করে বসে—'আমি আমার এই ভিটার চেহারা ফিরাবো আলেফ কয়া দিলাম আর জমি নিবি এট্টু। এট্টা গাই গরু আর দুটো বলদ কিনবি।' কারণ মায়ের ধারণা তার মুক্তিযোদ্ধা সন্তানকে সরকার নিশ্চয়ই পুরস্কৃত করবে। যুদ্ধ-পরবর্তী জীবনবাস্তবতা সম্বন্ধে দ্রুতই সম্যক একটি ধারণা পেয়ে যায় আলেফ। তাদের মতো 'মুক্তিযোদ্ধাদের বুকে থাপ্পড় মেরে স্বাধীনতার খবর পৌঁছে দেওয়া ছাড়া আর কিছু করার থাকে না। কিছুদিনের মধ্যে স্বাধীনতা ব্যাপারটি পুরনো হয়ে যায়। সেই পুরনো ধান্দাবাজ, সুবিধাবাজ, কৃত্রিম দেশপ্রেমিকে ভরে যায় দেশ-গ্রাম' (চন্দন ২০১৯: ১৪৩)। আলেফ বুঝতে পারে 'স্বাধীনতা' তাদের মতো দরিদ্রদের অবস্থার কোনো পরিবর্তন করতে পারবে না।

তারা এতদিন যুদ্ধ করেছে দেশকে বাঁচানোর জন্য, এখন যুদ্ধ করতে হবে পেটের দায়ে। তাই সে অস্ত্র জমা না দিয়ে বাড়ির পিছনে ডোবায় ফেলে দেয়। তার উপলব্ধি: রাইফেলটা হয়ত আবার কাজে লাগতে পারে। কারণ যুদ্ধপরবর্তী সমাজবাস্তবতা অবলোকন করে তার মানসচেতনায় এই বোধ জন্মেছে যে, যুদ্ধ কখনো থামে না।

'ঝড়' গল্পে যুদ্ধের প্রারম্ভিক পর্যায়ে সংঘটিত নারকীয় হত্যাযজ্ঞ, নির্যাতন-নিপীড়ন, ধর্ষণ প্রভৃতি ঘটনার চিত্র বর্ণিত হয়েছে। এ গল্পে দেখা যায় ২৫শে মার্চ রাতে পাকসেনাদের নৃশংস, নির্মম হামলার শিকার মানুষ ঘরবাড়ি এবং শহর ছেড়ে এক রাতের মধ্যেই পালিয়ে যায়। পাকিস্তানি হানাদারেরা শহরে আগুন লাগিয়ে দেয়, আগুনের লেলিহান শিখা মুহূর্তেই ছড়িয়ে পড়ে শহরময়। চারদিক থেকে ভেসে আসে ধোঁয়া আর পোড়া গন্ধ। এমন অবস্থায় অনেকের মতো লেখক নিজেও গ্রামের উদ্দেশে রওনা দেন। একটি ছোটো নৌকায় করে নদী পার হওয়ার পথে নৌকার মাঝির কাছেও শুনতে পান, পাকহানাদার বাহিনীর নির্মমতার কথা—'শহরের মোড়ে মোড়ে লোক পড়ে মরে আছে। ঘিলু ছিটকে রাস্তায় পড়েছে, কল কল করে রক্ত ড্রেন দিয়ে চলেছে' ইত্যাদি। একপর্যায়ে পথিমধ্যে প্রচণ্ড ঝড়ের কবলে পড়ে দু কামরার এক মেটে বাড়িতে আশ্রয় নেন। সেখানে দেখতে পান যুদ্ধকালীন আরেক বাস্তবতা—নারী নির্যাতনের ভয়াবহ চিত্র। বাংলাদেশের মুক্তিযুদ্ধের এক দুর্বিষহ ও ভয়ংকর অধ্যায় নারী নির্যাতন। মুক্তিযুদ্ধের নয় মাসে দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ধর্ষণ, নির্যাতন ও লাঞ্ছনার বীভৎস তাণ্ডবে মেতে উঠেছিল পাকিস্তানি হানাদার বাহিনী ও তাদের এ দেশীয় দোসরেরা। নারীত্বের এমন অবমাননার তুলনা ইতিহাসে বিরল। লেখক, সাংবাদিক, গবেষক ও প্রত্যক্ষদর্শীদের বিবরণে স্বাধীনতা যুদ্ধের সময় ধর্ষণ ও নির্যাতনের ভয়াবহ তাণ্ডবের নানা চিত্র লিপিবদ্ধ হয়েছে। নারী নির্যাতনের নানা ধরনের মধ্যে রয়েছে—স্বামীর সামনে স্ত্রীকে, পিতার সামনে কন্যাকে, শ্বশুরের সামনে পুত্রবধুর ধর্ষণ, পরিবারের সকলের সামনে মেয়েদের গণধর্ষণ ও হত্যা, ধর্ষণের পর বিকৃত যৌন নির্যাতন, ক্যাম্পে বন্দি করে দিনের পর দিন ধর্ষণ, নির্যাতন, ব্রাশফায়ার করে হত্যা করা ইত্যাদি (মালেকা ২০১১: ১৬৪-৬৫)। দেশের প্রতিটি অঞ্চলে ধর্ম-বর্ণ-সম্প্রদায় নির্বিশেষে নারীদের ওপর নির্যাতন চালিয়েছে পাকহানাদার বাহিনী। এ জাতির প্রতিরোধের সমস্ত শক্তিকে নিঃশেষ করার ও নৈতিক মেরুদণ্ড ভেঙে দেওয়ার মানসিকতা থেকে এই তাণ্ডবে মেতে ওঠে হানাদারেরা। 'ঝড়' গল্পে মুক্তিযুদ্ধকালীন নারী নির্যাতনের সেই বাস্তব চিত্রের প্রতিফলন ঘটেছে। এ গল্পের লেখক প্রায় এক ঘণ্টা ঝড়-বৃষ্টি শেষে প্রকৃতি শান্ত হলে পাশের ঘরে উঁকি দিতেই দেখেন সম্পূর্ণ উলঙ্গ এক নারীর মৃতদেহ, যার শিশুসন্তান মৃত মায়ের স্তন চুষে দুধ পান করার চেষ্টা করছে। নারীকে ধর্ষণ ও হত্যা করেও নিবৃত্ত হয় না মানুষরূপী পশুগুলো, হিংস্র প্রাণীর মতো সেই নারীর দেহকে নিয়ে মেতে ওঠে নারকীয় খেলায়। প্রাসঙ্গিক অংশ লেখকের ভাষায়—

> পুব দিকের দেয়াল ঘেঁষে একটি স্ত্রীলোকের মৃতদেহ। শ্যামলা রঙের ছিপছিপে কিন্তু পুষ্ট দেহটি। এত তাজা মনে হয় জ্যান্ত। আমি হয়ত তাই মনে করতাম যদি না দেখতাম দেহটি সম্পূর্ণ উলঙ্গ। ঘন নীল রঙের মোটা কাপড়টি ঘরের এক কোণে জড়ো করা। ... মেয়েটির তরুণ শরীরে কোথাও কোনো খুঁত দেখতেও পেলাম না। তার সারা শরীরে রোদ। শুধু একটি মাত্র খুঁত। মেয়েটির

> যোনি নেই। যোনির জায়গায় বিরাট একটি গহ্বর। সেই জায়গাটিতে রোদ যেতে পারেনি। কালো, ঘন কালো বিরাট গর্ত। (হাসান ২০১১: ২৪৫)

'নবজাতক' গল্পে যুদ্ধের চূড়ান্ত পর্বে দখলদার পাকবাহিনীর ওপর মিত্র বাহিনীর বোমারু বিমানের আক্রমণ, পাকসেনাদের পলায়ন, নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে আতঙ্কিত সাধারণ মানুষের হন্যে হয়ে ছোটা প্রভৃতি বিষয়ের পাশাপাশি দীর্ঘ নয় মাস সংগ্রামের ফলে জন্ম নেওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে এক গর্ভবতী নারীর প্রসব-যন্ত্রণার সঙ্গে প্রতীকায়িত করে উপস্থাপন করেছেন লেখক। গল্পে দেখা যায়, দীর্ঘ নয় মাস যুদ্ধ শেষে মিত্রবাহিনীর 'রাগি বোলতার মতো প্লেনগুলো সৈনিকদের পিছনে লেগেই আছে'; ফলে তারাও পালাচ্ছে, সাধারণ মানুষও পালিয়ে যাচ্ছে। নিরাপদ আশ্রয়ের খোঁজে মানুষ দিগ্বিদিক ছুটছে। এরই মধ্যে লেখক দেখতে পান ঝোপের মধ্যে এক গর্ভবতী নারী প্রসব-বেদনায় কাতর। তার শরীর থেকে নির্গত হচ্ছে কাঁচা রক্ত। তার উদরের গহ্বর থেকে জন্ম নেবে এক নবজাতক। এ ঘটনার অবতারণার মধ্য দিয়ে লেখক দীর্ঘ সংগ্রাম, অবর্ণনীয় কষ্ট ও এক সমুদ্র রক্তের বিনিময়ে জন্ম নিতে যাওয়া বাংলাদেশের স্বাধীনতাকে প্রতীকী পরমার্থে বিন্যস্ত করেছেন।

ডিসেম্বরের প্রথম সপ্তাহে মিত্রবাহিনীর যুদ্ধবিমান হামলার ফলে পাকসেনাদের পলায়ন এবং বোমা হামলার ফলে ভয়ানক পরিস্থিতির আশঙ্কায় কথক ও তার সহকর্মীর পরিবার-পরিজনসহ শহর ছেড়ে গ্রামে আশ্রয় নেওয়ার কাহিনি বর্ণিত হয়েছে 'মাটির তলায় মাটি' গল্পে। গল্পে দেখা যায়, যুদ্ধের শেষ পর্যায়ে মিত্রবাহিনী কর্তৃক পাকসেনাদের টার্গেট করে যুদ্ধবিমান থেকে বোমা নিক্ষেপের ঘটনায় পাকিস্তানি সেনারা দ্বিগ্বিদিক জ্ঞানশূন্য হয়ে পলায়ন করছে। পালানোর সময় তাদের বুট খুলে যায়, মোজা ছিঁড়ে যায়, প্যান্ট ঢিলে হয়ে যায়, চোখে-মুখে তীব্র অসহায়ত্বের ছাপ স্পষ্ট হয়ে ওঠে। এভাবে 'প্রায় এক সপ্তাহ ধরে ভারী ভারী গাড়ি করে বা অস্ত্রশস্ত্র, সাজ-সরঞ্জাম, লাটবহর নিয়ে পায়ে হেঁটে পাকিস্তানি সৈন্যরা পালিয়েছে।' আকাশ থেকে বোমাবর্ষণ থামছে না, 'ক্রুদ্ধ বোলতা যেমন কিছুতেই শত্রুর পিছু ছাড়ে না ঠিক তেমনি করে প্লেনগুলো ঘুরে ঘুরে চক্কর দেয় আর থুতু ফেলার মতো আগুন ছিটোতে থাকে।' এ অবস্থায় আরো ভয়ানক পরিস্থিতির আশঙ্কায় কথক এবং তাঁর সহকর্মী পরিবারসহ গ্রামে এক দরিদ্র কৃষকের বাড়িতে আশ্রয় নেয়। কৃষক কাঁচকলা দিয়ে গরম ভাত খাইয়ে তাদের আপ্যায়ন করে। গল্পের এ পর্যায়ে কথক ও কৃষকের কথোপকথনে উঠে আসে ভিন্নতর এক বাস্তবতার চিত্র। দেখা যায় কথক এবং তাঁর সমগোত্রীয় কিছু মানুষ মুক্তিযুদ্ধের প্রায় পুরোটা সময় পালিয়ে বেড়িয়েছে, অথচ দরিদ্র কৃষকের পালানোর কোনো উপায় ছিল না। কারণ তার জীবন-জীবিকার অবলম্বন এক টুকরো জমি। এ জমিতে চাষ করে কিছুদিনের খোরাকি জোটে এবং কিছু ফসল বিক্রি করে প্রয়োজনীয় জিনিসপত্র কেনার সুযোগ ঘটে। তাই জমি ফেলে গেলে পরদিন থেকে উপোস করে থাকতে হবে। ফলে রাজাকার-আলবদর, পাকসৈন্যদের অত্যাচার-নির্যাতন মুখ বুঁজে সহ্য করে ভিটে আঁকড়ে পড়ে থেকেছে সে। কথকের মতো শিক্ষিত লোকেরা মুখে বড়ো বড়ো কথা বলেন—'ত্যাগ চাই, আমাদের সকলের ত্যাগ চাই'; অথচ প্রকৃত ত্যাগস্বীকার এই কৃষকরাই করেছেন।

বাঙালির মহান মুক্তিযুদ্ধ বাস্তবতার সকল রূঢ়তা এবং নির্মমতা নিয়ে হাসান আজিজুল হকের গল্পের ক্যানভাসে চিত্রায়িত হয়েছে। মুক্তিযুদ্ধকালে এ ভূখণ্ডের মানুষের ওপর দিয়ে ঘটে যাওয়া যাবতীয় নিপীড়ন, নির্যাতন, বর্বরতার ছবি লেখক নির্মোহ ভঙ্গিতে উপস্থাপন করেছেন। লেখক হিসেবে ইতিহাসের কাছে নিজের দায় যেমন তিনি বিস্মৃত হননি, তেমনি বিস্মৃত হননি শিল্পের দায়ও। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধ তার বহুমাত্রিক ব্যাপকতা নিয়ে ধরা দিয়েছে হাসানের গল্পে। স্বাধীনতাকামী মানুষের বিপুল আত্মত্যাগ, অশ্রু ও রক্তের প্লাবন, সুখী-সমৃদ্ধ জীবনের স্বপ্ন এবং স্বপ্নভঙ্গের যন্ত্রণা-বঞ্চনা ও ব্যর্থতার বোধও প্রতিবিম্বিত হয়েছে এসব গল্পে। এ দেশের আপামর মানুষের জীবনে নানা বর্ণে, নানা ব্যঞ্জনায় প্রতিভাত হয়েছিল মুক্তিযুদ্ধ। প্রান্তবাসী সাধারণ মানুষের কাছে মুক্তিযুদ্ধ ছিল অভাব, বঞ্চনা আর ক্ষুধা থেকে মুক্তির আশা। এ কারণে মুক্তিযুদ্ধের নয়টি মাস হানাদার এবং তাদের এ দেশীয় দোসরদের অবর্ণনীয় নির্যাতনের মধ্যেও তারা সাহায্য করেছে মুক্তিযোদ্ধাদের, প্রার্থনা করেছে তাদের সফলতার জন্য। বুকের রক্তে প্রিয় জন্মভূমির বুক রঞ্জিত করার মুহূর্তেও আশা করেছে, আত্মত্যাগের বিনিময়ে তাদের সন্তান মাথা উঁচু করে বাস করবে মুক্ত স্বাধীন স্বদেশে। স্বাধীনতার এই দুর্মর বাসনা, মুক্তিযোদ্ধাসহ সাধারণ মানুষের আত্মত্যাগ ও বীরত্ব, হানাদার ও তাদের দোসরদের নির্মমতা, এমনকি যুদ্ধপরবর্তী সময়ের করুণ বাস্তবতা—এ সবকিছুই বাস্তবতার রঙে রঞ্জিত হয়ে উপস্থাপিত হয়েছে হাসান আজিজুল হকের ছোটোগল্পে। এ কারণেই মুক্তিযুদ্ধের সকল কথাশিল্পীর মধ্যে হাসান এক স্বাতন্ত্র্যচিহ্নিত শক্তিশালী অবস্থানের দাবিদার। তাঁর গল্প নিরবধিকাল বাঙালিকে প্রেরণা জোগাবে, তাদের মনের মধ্যে জাগিয়ে রাখবে মুক্তিযুদ্ধের অম্লান চেতনা।

সহায়কপঞ্জি

আবু জাফর (১৯৯৬)। *হাসান আজিজুল হকের গল্পের সমাজবাস্তবতা*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

আবুল হাসনাত (২০০৭)। *হাসান আজিজুল হকের মুক্তিযুদ্ধ রচনাসমগ্র*। ঢাকা: চারুলিপি প্রকাশন

চঞ্চল কুমার বোস (২০১৬)। *বাংলাদেশের ছোটগল্প: জীবনজলধির শিল্প*। ঢাকা: সুচয়নী পাবলিশার্স

চন্দন আনোয়ার (২০১৯)। *হাসান আজিজুল হকের কথাসাহিত্য: বিষয়বিন্যাস ও নির্মাণকৌশল*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

মালেকা বেগম (২০১১)। *মুক্তিযুদ্ধে নারী*। ঢাকা: প্রথমা প্রকাশন

সরিফা সালোয়া ডিনা (২০১০)। *হাসান আজিজুল হক ও আখতারুজ্জামান ইলিয়াসের ছোটগল্প: বিষয় ও প্রকরণ*। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

সিরাজুল ইসলাম (২০০৩)। 'বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের ছোটগল্প', *বাংলাদেশের পঁচিশ বছরের সাহিত্য* (সাঈদ-উর-রহমান সম্পাদিত)। ঢাকা: বাংলা একাডেমি

হাসান আজিজুল হক (২০০৩)। 'বাংলাদেশ পালিয়ে বেড়ায় দৃষ্টি এড়ায়, অতলের আঁধি', *রচনাসমগ্র-৪*। ঢাকা: সাহিত্যিকা

হাসান আজিজুল হক (২০১১)। *গল্পসমগ্র-১*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

হাসান আজিজুল হক (২০১১)। *গল্পসমগ্র-২*। ঢাকা: মাওলা ব্রাদার্স

Abdullah, Zobayer. "হাসান আজিজুল হকের স্বাধীনতা-উত্তর ছোটগল্পে নিম্নবর্গীয় মানুষের অস্তিত্বসংকটের রূপায়ণ." *সাহিত্য পত্রিকা-Shahitto Potrika/ University of Dhaka*, vol. 56, no. 1, 2018, pp. 253–70, https://doi.org/10.62328/sp.v56i1.10.